❖ "নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন" (১৮৭৬খ্রিষ্টাব্দ ১৬ ডিসেম্বর) সম্পর্কে আলোচনা করো।

তমালকান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কণ্ঠ রোধ করার জন্য ১৯৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার চালু করেন নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performance Control Act) এই কালাআইন চালু করার পেছনে শ্বেতাঙ্গ সরকারের কোনো তাৎক্ষণিক ভাবনা ছিলনা; ছিল সুদূরপ্রসারী ভাবনা চিন্তা। এই আইন চালু করার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি রয়েছে বলে মনে করি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ শাসকের প্রতি বাঙালির একটা ইতিবাচক মনোভাব ছিল। রামমোহন বা অক্ষয় কুমার দত্তের মতো মানুষ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। কিন্তু এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। ইংরেজ শাসকের প্রতি নানা ঘটনা পরম্পরায় শিক্ষিত বাঙালির মোহভঙ্গ শুরু হয়। পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে বাঙালির মধ্যে জাগতে থাকে দেশাত্মবোধ ভাবনা-চিন্তা- পরাধীনতার জন্য বেদনা। ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় মেলা বা হিন্দু মেলা। বিভিন্ন ধরনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। সময়ের এই প্রেক্ষিতে আবার সখের থিয়েটার রূপান্তরিত হল সাধারণ রঙ্গালয়ে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যে সাধারণ রঙ্গালয়টি গড়ে উঠল, কলকাতায় তার নাম হলো 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর এই থিয়েটারের উদ্বোধন রজনীতে মঞ্চস্থ হল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। বলা যায় ব্রিটিশ বিরোধী বা শাসক বিরোধী সুরের নাড়া বাঁধা হয়ে গেল, এর মধ্য দিয়ে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' ও 'শরৎ সরোজিনী'। শরৎ সরোজিনীতে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতা সংলাপে ও চরিত্রের আচরণে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৫ সালের বরোদার ঘটনা নিয়ে 'হীরক চূর্ণ' নাটক লিখলেন রসরাজ অমৃত লাল বসু। নাট্যকার দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখলেন- 'চা-কর দর্পণ'। নাটকটি অভিনীত না হলেও 'হীরকচূর্ণ' মঞ্চস্থ হয়। থিয়েটারের ক্ষমতা কতটা, তা ভালই জানত শ্বেতাঙ্গ শাসক। তাই ভেতরে ভেতরে তারা প্রমাদ গুনল। নাটকও রঙ্গমঞ্চের কণ্ঠরোধ করার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি চালাতে লাগল।

তবে উপলক্ষ হিসেবে যে ঘটনার কথা না বললেই নয়, তা হল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনের অভিনয়। এই প্রহসনের যুবরাজ সাধারণ কেউ নন, একেবারে ইংল্যান্ডের মহারাজা। ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েলস্। ইনি এসেছিলেন কলকাতায় এবং হঠাৎ করে তাঁর শখ হল বাঙালি অন্তঃপুরের মহিলাদের দেখলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষে মারাত্মক প্রস্তাব। যুবরাজের শখ পূরণে এগিয়ে এলেন ভবানীপুর নিবাসী হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ির মেয়েরা যুবরাজকে উলু দিয়ে বরণ করলেন। সেদিনের কলকাতা এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড়। ব্যঙ্গকবিতা লেখা হল। ঘটনাটিকে ব্যঙ্গ করে প্রহসন লিখলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। প্রহসনের নাম 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৬ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারি সরোজিনী নাটকের সঙ্গে এটি অভিনীত হল। রাজভক্ত সম্ভ্রান্ত প্রজাকে বিদ্রুপ করার অভিযোগে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রশাসনের চোখে ফাঁকি দিতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বিষয়টি একই রেখে প্রহসনের নাম পাল্টে করলেন-" হনুমান চরিত্র"। হনুমান চরিত্র ও পুলিশ নিষিদ্ধ করল। তখন পুলিশের বড়কর্তাদের বিদ্রুপ করে লেখা হল-" দি পুলিশ অফ পীগ অ্যান্ড শীপ"। সুরেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে তা অভিনীত হল- ১৮৭৬ সালের ১লা মার্চ। ইতিমধ্যে লর্ড নর্থব্রুক জারি করলেন এক অর্ডিন্যান্স। ৪ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে "সত্তা কি কলঙ্কিনী" অভিনয়ের সময় পুলিশ রঙ্গমঞ্চ ঘিরে ফেলে এবং গ্রেপ্তার করে থিয়েটারের লোকজন ও মালিক কে। কোনো পুলিশের অভিযোগ টিকল না, কিন্তু সরকার আইন প্রণয়নে এগিয়ে যেতে লাগল। নাট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বিল বা আইনের খসড়া প্রকাশিত হল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু সমস্ত বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন করা করা হল- ১৮৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

আইনে কি কি বলা ছিল:-

ক. অশ্লীল, মানহানিকর, সমাজ মন বিক্ষিপ্ত করতে পারে বা রাজদ্রোহ মূলক বা প্ররোচনামূলক নাটকের অভিনয় চলবে না। এর অন্যথা হলে শাস্তি পাবেন নাট্যকার এবং নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত যেকোনো ব্যক্তি- এমনকি দর্শক পর্যন্ত।

খ. নাটক অভিনয়ের আগে পান্ডুলিপি পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে এবং অনুমতি পেলে অভিনয় করা যাবে।

এইভাবে ব্রিটিশ শাসক নাটক তথা থিয়েটারের প্রতিবাদী স্বর দমন করতে তৈরি হল কালাআইন। পত্রপত্রিকায় এর বিরুদ্ধে সমালোচনা হলেও এই আইন বন্ধ করা হল না। সবমিলে বাংলা থিয়েটারের ওপর এর ফল হল গভীর।

ফলাফল :-

ক. প্রত্যক্ষ ফল হল- রঙ্গমঞ্চের শূন্যদশা। মামলা মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হলেন ভুবন মোহন নিয়োগী। উপেন্দ্রনাথ দাস বিলেতে চলে গেলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু আন্দামানে চলে গেলেন। সুকুমারী দত্ত থিয়েটার ছেড়ে দিলেন আর অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

খ. রঙ্গমঞ্চের শূন্যতা সাময়িকভাবে পূরণ করল বাংলার "পৌরাণিক নাটক।" এই সূত্রের রঙ্গমঞ্চে পদধূলি পড়ল সাধু-সন্ন্যাসীদের। রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠল তীর্থক্ষেত্র।

গ. রঙ্গমঞ্চে তথা নাট্যসাহিত্যে জীবন সংগ্রামের চেয়ে বড় হয়ে উঠল দেব আদর্শ।

ঘ. কিছু পরে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল লঘু নাচ গানের গীতিনাট্যের প্রসার। যার ফলে বাংলা নাটক তার বলিষ্ঠতা হারাল, হারালো তার স্বাভাবিক গতিপথ।

ঙ. আইনের কুফল এখানেই শেষ হল না। বহু নাটক এই আইন বলে নিষিদ্ধ করা হল। এই তালিকায় রয়েছে- গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা, মীর কাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, ক্ষীরোদ প্রসাদের পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাঙ্গলার মসনদ, নন্দকুমার, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, দাদা ও দিদি, অমৃতলাল বসুর চন্দ্রশেখর (নাট্যরূপ), মন্মথ রায়ের কারাগার, শচীন সেনগুপ্তের নরদেবতা এর মত বহু নাটক।

স্বাধীন ভারতেও বাংলা নাট্যের স্বাভাবিক গতিপথকে ব্যাহত করার জন্য বিভিন্ন শাসক বারবার এই আইনকে কাজে লাগিয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:-

১. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস:- দর্শন চৌধুরী।

২. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস:- ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস:- অজিত কুমার ঘোষ।